OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 715 - 719
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 715 - 719
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভেদ-অভেদের কথাবস্তু : ‘দিব্যবদানমালা’ এবং ‘চণ্ডালিকা’

ড. শান্তনু প্রধান
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের
Email ID: pradhansantanu89@gmail.com
0009-0002-3673-3444

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Influence of Buddhist ideas, Dharma, Brahma, Dance Drama, Buddhist. Philosophy.

Abstract
While possessing world-class talent, Rabindranath Tagore was primarily a poet. His roles as an essayist, novelist, short story writer, and playwright were secondary to his versatile talent. Tagore's free-flowing style enriched every branch of literature he touched. His brilliant talent illuminated any subject, making his originality and uniqueness captivating and exciting.His philosophical and ideological thinking was profoundly influenced by Buddhist thought, which re-emerged in the 19th century. Figures like Maharishi Debendranath Tagore, Keshav Chandra Sen, and Satyendranath Tagore expanded the reach of Buddhist philosophy. While others, such as Rahul Sankrityayan, also wrote about Buddha (e.g., 'Mahamanav Buddha'), Tagore's unique engagement with Buddhist thought and its creative application opened new horizons in Bengali literature. His literary collection gained distinction through both his direct studies of Buddha and his incorporation of Buddhist ideas into new works.Tagore's creative talent was unparalleled—lofty as a mountain, vast as the sky, and serene as the wind. His ability to assimilate and transform ideas set a precedent in both Bengali and world literature. The play 'Chandalika' (1933) and its dance-drama version (1939) are prime examples. The story is based on the 'Shardulkarnavadan' episode from the 'Divyavadanmala'. It is uncertain how familiar Tagore was with the Buddhist narrative collection 'Divyavadanmala'. The discussion will explore the extent to which Tagore followed the original story and where he introduced his own originality.

Discussion

বিশ্ববন্দিত প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গল্প রচয়িতা, নাট্যস্রষ্টা প্রভৃতি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার গৌণ পরিচয়। সাহিত্যের যে কোনো শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের অবাধ সঞ্চরণ। রবীন্দ্রনাথের হীরকোজ্জ্বল প্রতিভার স্পর্শে মানবিক চিন্তন-মননে যেকোনো বিষয় জ্যোর্তিময় হয়ে ওঠে। তাঁর মৌলিকতা ও অনন্যতা কোথাও ঢাকা পড়ে না, তা মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে এবং উদীপ্ত করে। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধের মতাদর্শ ও ভাবাদর্শ গভীরভাবে তাঁর চিন্তাশীল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 715 - 719
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মননকে নাড়া দিয়েছিল। কারণ উনিশ শতকে পুণরায় বুদ্ধ চিন্তাচর্চার প্রভাব লক্ষ করা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বরা বৌদ্ধ ভাবনাকে আরো সুদূরপ্রসারী করে তুলেছিলেন। আবার রাহুল সাংকৃত্যায়ন বুদ্ধের জীবনী নিয়ে 'মহামানব বুদ্ধ' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধভাবনা ও তাঁর বিনির্মাণ-ধর্মী রচনা বাংলা সাহিত্যে নতুন এক দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। একদিকে বুদ্ধ সম্পর্কে নানা বিদ্যাচর্চা এবং অন্যদিকে নবতর সৃষ্টির আঙ্গিকে বুদ্ধভাবনা তাঁর সাহিত্য সম্ভারকে অনন্যতা দান করেছে। এই নবতর সৃষ্টি সম্পর্কে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন—

> "ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বুদ্ধদেবই একমাত্র মনীষী যাঁর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে আজীবন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম জীবনে সমালোচনা বইয়ের অন্তর্গত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১২৯০ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শরীরাংশ (দন্ত) দেখে, শিলায় তাঁর পদচিহ্ন দেখে মুগ্ধ হবার কথা লিখেছিলেন। পরে মানুষের ধর্ম (১৯৩৩) গ্রন্থে বুদ্ধদেবকে 'সর্বজনীন সর্বকালীন' মানবরূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।... বৌদ্ধসাহিত্য ও শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ উপকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুব অল্পই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (1882) বইটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় বইটির প্রকাশের পর থেকেই। ছিন্নপত্রাবলী-র একটি চিঠিতে দেখেছি (১৮৯৩ মার্চ ৩), বইটি তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর ব্যবহৃত বইটি এখন রবীন্দ্রভবনে রয়েছে। বইটির মলাট ও আখ্যাপত্রের মাঝখানে সাদা পাতায় যে কাহিনিগুলি তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন তাদের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা নিজের হাতে লিখে রেখেছেন। তার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তা জানেন। সব কবিতাগুলি ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে রচিত এবং কথা কাব্যের অন্তর্গত। মালিনী, চণ্ডালিকা এবং রাজা নাটকের কাহিনিও এই বই থেকে নেওয়া।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সৃজন প্রতিভা অনন্য। তিনি পর্বতের মতো সুউচ্চ, আকাশের মতো বিশাল, বাতাসের মতো প্রশান্ত। রবীন্দ্রনাথের আত্তীকরণের ক্ষমতা বাংলা সাহিত্য তো বটে বিশ্বসাহিত্যেও অনন্য নজির গড়েছেন। 'চণ্ডালিকা' (নাটিকা ১৯৩৩, নৃত্যনাট্য ১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। এই রচনার কাহিনি 'দিব্যবদানমালা'র অন্তর্গত 'শার্দুলকর্নাবদান'-এর ঘটনা অবলম্বনে রচিত। আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ কতটা মূল কাহিনি অনুসরণ করেছেন আর কতটাই বা মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ আখ্যান আশ্রিত 'দিব্যবদানমালা'র সঙ্গে কতটা পরিচিত ছিলেন তা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদ 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' [Cal.1882] পড়ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচনার শুরুতে 'শার্দুলকর্ণাবদান'-এর মূল কাহিনি[২] জেনে নেওয়া যেতে পারে—

কাহিনির ঘটনার স্থল শ্রাবস্তী। ভগবান বুদ্ধ তখন গৃহী শিষ্য অনাথপিণ্ডদের উদ্যান বাটিকায় বিশ্রামরত। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করল। দেখতে পেল এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইল। সে দিল। তার রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাকে পাওয়ার জন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইল। তার মা যাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে বেদি প্রস্তুত করে আগুন জ্বালালো। মন্ত্র উচ্চারণ করল। আনন্দ যাদুশক্তির অপ্রতিরোধ্য মায়ায় সেখানে উপস্থিত হল। সে বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি বিছানা পাততে লাগল। কিন্তু, সেই সময়ে আনন্দের মনে পরিতাপ জেগে উঠল, বুদ্ধ মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিতে চণ্ডালিনীর বশীকরণ বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল। আনন্দ সবমোহ ছিন্ন করে ফিরে এলো মঠে। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনিকে গ্রহণ করেও তাতে যুক্ত করেছেন মৌলিক অনুভব, কল্পনাবৈচিত্র্য হৃদয়ের রঙ, হৃদয়ের স্পর্শ। আশ্চর্যের বিষয় মূল কাহিনির সাথে পরিচিত না হয়েও কেবলমাত্র অনুভূতির নিবিড়তায় তিনি মূলের আখ্যান গৌরব স্পর্শ করেছেন। কারণ তাঁর জীবনচিন্তায় যে মানবপ্রেম এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ ছিল তা তাঁর চরিত্রের অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে পরিণত পুরুষ সংস্কার থাকলেও ঐ চেতনার পরিপুষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়।[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 715 - 719
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'[৪] শুরু হয়েছে বৈশাখের নিঝুম দুপুরে, কাঠফাটা রোদ্দুরে প্রকৃতি বেরিয়েছে অনির্বচনীয় আনন্দে। মা তাকে জিজ্ঞাসা করেছে ঘর ছেড়ে রোদে পুড়ে কার জন্য এ তপস্যা। প্রকৃতি বলেছে যিনি জাত-পাত শুচি অশুচির অহংকার দূরে সরিয়ে 'চণ্ডালিকা'র কাছে 'জল দাও' বলে জল চেয়েছে। তার জন্য এই তপস্যা। এই জাতপাতের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ মূল ঘটনা থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।[৫] যা মৌলিকত্বেরই লক্ষণ। পিপাসার্তকে জল দান করা সেবাধর্ম কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আনন্দ যে কথা বলেছেন তা প্রকৃতির অন্তরকে আলোড়িত করেছে—

"যেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা
সেই বারি তীর্থ বারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।"[৬]

যুক্তি ও আদর্শের আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে এই সংলাপে। এখানে আনন্দ যে মহাতাপস তার-ই ব্যঞ্জনা আছে। রবীন্দ্রনাথ মহাতাপস আনন্দের তপস্বীরূপ আশ্চর্য দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন—

"আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার
যার অধিকার আমার দানে।
যে আমারে চিনতে পারে
সেই চেনাতেই চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে
তার প্রাণে আর আমার প্রাণে।
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি,
ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,
নয়ন আমার ছুটেছে তার
আলো-করা মুখের পানে।"[৭]

আনন্দের জল প্রার্থনায় প্রকৃতির হৃদয়ের যে আলোড়ন তা মূল কাহিনিতে নেই। অথচ আনন্দের 'জল দাও' কথাটি প্রকৃতির অন্তরলোককে শোষিত করেছে। এ যেন তার নবজন্ম। তার জন্মান্তর কবে কেমন করে সম্ভব হল তা জানতে চাইলে উত্তর এসেছে —

> "সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদদুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, 'জল দাও'। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ।"[৮]

চণ্ডালের মেয়ে বলে প্রকৃতি প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু আনন্দের কথায় কেঁপে উঠেছে বুক। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে 'জল দাও' কথাটিকে হীনমন্য ভীরুতার সংস্কার থেকে বহু ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে গেছেন। প্রকৃতি বলেছে—

> "কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 715 - 719
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এত আকুলতা, হৃদয়ের এতো পরিবর্তন মূল কাহিনিতে ছিল না। এ যেন মর্ত্যের মাটিতে বসে অমর্ত্যের বাণী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি শুনিয়েছে। তাই তো সে নেচেছে, দুপুরের ঠা-ঠা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর বলেছে—

"গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত-দাও জল, দাও জল।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নাটকে প্রকৃতি ও তার মায়ের সংলাপে মা ও মেয়ের আকুলতা অকৃত্রিম ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে। মেয়ের জন্য মায়ের আচরণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। মা ভেবেছে সন্ন্যাসী বুঝি মন্ত্র পড়ে তার মেয়েকে গুণ করেছে। এমন আকুলতা রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতারই যেন নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'য় নারীত্বের মর্যাদা দাসীত্বের হীনতা থেকে বেরিয়ে সেবিকার আসন গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির এই গৌরব রবীন্দ্রনাথ অনায়াস ভঙ্গিমায় দেখিয়েছেন। নব জন্মের আনন্দ তাকে উত্তাল করে তুলেছে। সে বলেছে—

"আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে।"[১১]

এমন করে নারীহৃদয়ের আকুলতা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। মায়ের তিরস্কার সহ্য করে ও প্রকৃতি ভেঙে পড়েনি বরং প্রতিবাদ করেছে। মাঠ পেরিয়ে শ্মশান পেরিয়ে রৌদ্র মাথায় নিয়ে সে নদীর তীরে ছুটে গেছে। তাই মা আনন্দকে ডেকেছে। যাদুমন্ত্রে আনন্দ চণ্ডাল গৃহে উপস্থিত হয়েছে। তাকে দেখে মুক্তির আনন্দে বিহ্বল প্রকৃতি আত্মনিবেদন করেছে—

"টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে।"[১২]

মেয়ের জন্য মায়ের এই অসাধ্য সাধন প্রশংসার দাবি রাখে। তাই প্রকৃতির মা ও অনিচ্ছাকৃত পাপাচারণের জন্য আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে মৃত্যু বরণ করে। মূল কাহিনিতে মা মৃত্যু বরণ করেনি। এরপর করুণাঘন আনন্দ ভগবান বুদ্ধের নাম গানে ভরিয়ে দেয় বাতাস। তবে মূল কাহিনির লক্ষ্য ছিল বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ ঘটানো এবং মানুষের আপন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। তাই মূল কাহিনিতে চণ্ডালিকা যখন ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করেছে তখন ভগবান বুদ্ধ তাকে তার পূর্বজন্মের কাহিনি বর্ণনা করেছে। সেখানে আছে ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে চণ্ডাল পুত্রে বিবাহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাদুস্পর্শে এই কাহিনির ভাববস্তুকে নিয়ে নব নির্মাণে নাটক রচনা করলেন। তাই এখানে চণ্ডালিনীকে দেখা যায় ভিক্ষু আনন্দের প্রেমে পাগল হতে। এখানে মূল কাহিনির আদর্শ রক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ জয়ী হয়েছেন।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ আপন বিশ্বাস ও আদর্শকে কাজে লাগিয়েছেন। মানবিকতাকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন 'চণ্ডালিকা'র স্বাধিকার চেতনার সাথে বঞ্চিত মানুষের মর্মকথা ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতির তীব্র ভোগ-লালসার উষ্ণতা তিরহিত হয়েছে আনন্দের ক্ষমাসুন্দর শান্ত পরশে। তার কামনা রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের প্রেম ও করুণাকে সাঙ্গীকৃত করে এক নিজস্ব ভুবন গড়েছেন 'চণ্ডালিকা' নাটিকায়—

"বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্, অহমাদরেণ তম্।"[১৪]

Reference:

১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, *রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা*, প্রথম সংস্করণ, পারুল, ২০১০, পৃ. ১৭-১৮
২. ঘটক,কল্যাণীশঙ্কর, *অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩১২
৩. ঘোষ, তারকনাথ, *ভারতসংস্কৃতিপুরুষ রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৭-১১৮
৪. চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ (সম্পাদনা), *রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা*, প্রথম প্রকাশ, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২০১-২০২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 715 - 719
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গ্রন্থ রচনার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে গোপা দত্ত ভৌমিক তাঁর 'চণ্ডালিকা ও শ্যামা: বৌদ্ধ কাহিনির নারীর নতুন নির্মাণ' প্রবন্ধে বলেছেন-

"আমাদের বর্ণাশ্রম শাষিত, জাতপাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কুসংস্কার আচ্ছন্নদীর্ণ দেশের অনৈক্যের সুযোগ কীভাবে নিচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসককুল। আইন অমান্য আন্দোলনের উত্তেজনা তখন তুঙ্গে, প্রথম গোলটেবিল বৈঠক কংগ্রেসের যোগদানের অভাবে বিফল... যোগ দিলেন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ১৯৩১ সেপ্টেম্বর। সবটাই ব্যর্থ হল, কারণ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনৈক্য, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, জাতপাতের প্রকট বিভিন্নতা। আবার শুরু হল দ্বিতীয় পর্বের আইন অমান্য আন্দোলন, প্রতিবাদী ঐক্য ভাঙতে বদ্ধ পরিকর শাসকগোষ্ঠী। ১৯৩২ সালের আগস্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করলেন 'কম্যুনাল আওয়ার্ড' - সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। যার ফলাফল ভারত ইতিহাসে সুদূর প্রসারী হয়েছে। আলাদা আলাদা কম্যুনাল ইলেকটোরেট হল পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দুদের মধ্যে দুটি, কাস্ট হিন্দু আর ডিপ্রেসড্ ক্লাস হিন্দু। যারবেদা জেলে এই বিভাজনের প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশনে বসলেন গান্ধীজি।

বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভেদাভেদের রাজনীতি তার রূপ প্রকাশ করছে-১৯৩৩-এ জার্মানির চ্যান্সেলর হবেন অ্যালফ্ হিটলার। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এগিয়ে যাবে ১৯৩৯-এর সামুহিক বিনস্টির দিকে। ভেদচিহ্নের তিলকপড়া মানব সমাজের যে চেহারা প্রতিনিয়ত ক্রুর থেকে ক্রুরতর হয়ে দেখা দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে-ভেদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণব্যবধানের বিরুদ্ধে একটি আশ্চর্য দৃঢ় এবং আপাতনম্র স্বর জেগে উঠেছে। 'পরিশেষে'-এর জুলাই, ১৯৩২-এ লেখা একটি বেদনাতুর কবিতায় 'জলপাত্র'।... এই কবিতার মূল শব্দটির গায়ে যে মালিন্যের ছোঁয়া লেগেছে তা যেন ধুয়ে দিয়েছেন কবি পরমযত্নে। এই কবিতাটির কোরকেই চণ্ডালিকার সম্ভাবনা নিহিত।"

৫. বড়ুয়া, সুনন্দা, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান,* প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৬৩
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড),* পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ. ৭১৪
৭. তদেব, পৃ. ২১৯-২২০
৮. তদেব, পৃ. ২১৫-২১৬
৯. তদেব, পৃ. ২১৬
১০. তদেব, পৃ. ২১৬
১১. তদেব, পৃ. ২১৯
১২. তদেব, পৃ. ২২৭
১৩. বড়ুয়া, সুনন্দা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৪
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২১